ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-১

উদ্ভিদবিজ্ঞান

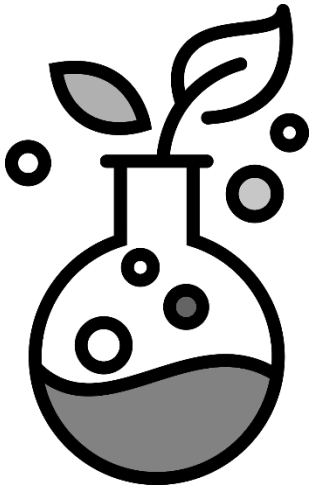

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-১

উদ্ভিদবিজ্ঞান

সম্পাদনা ও সংকলন
সমীর কান্তি নাথ
জয়দীপ দে

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-১
উদ্ভিদবিজ্ঞান
সম্পাদনা ও সংকলন : সমীর কান্তি নাথ ও জয়দীপ দে

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক ও সম্পাদকদ্বয়

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Udbhidbiggan edited by Samir Kanti Nath & Joydip Dey Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Second Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95631-3-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www. kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

বস্তুজগতে প্রছন্ন শক্তিকে উদঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ১৩
উদ্ভিদের ছড়িয়ে পড়ার কৌশল ২৫
উদ্ভিদের খাদ্য সংগ্রহ ৩০
উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদন ও পরিপুষ্টি ৩৫
অঙ্কুরোদ্গমের বৈচিত্র্য ৪৩
উদ্ভিদের অযৌন বংশবিস্তার ৪৮
ফুল ফোটে কেন? ৫৬
পরজীবী ৬০
উপকারী জীবাণুর কথা ৬৬
উদ্ভিদ জাদুকর ৭০
অদৃশ্য জীবজগতের বিস্ময় ৭৬
অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের গোড়ার কথা ৮২

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অগ্রদূত ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি বলতেন, *যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না, তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।*

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরিষদের পক্ষ থেকে সে বছরই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম সম্পাদক হিসেবে প্রকাশিত হলেও এর নেপথ্যে ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কলকাতার আপার সার্কুলার রোডের বসুবিজ্ঞান মন্দির থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি তখন দুই বাংলায় দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখনও পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। এ পত্রিকায় বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিষয়বস্তুগুলো রুচিশীল ভাষা ও সাবলীল বর্ণনায় উপস্থাপন করা হতো। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি কিশোর-তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা বিনির্মাণে এই পত্রিকার ভূমিকা অনন্য। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর পুরনো সংখ্যাগুলো ঘেঁটে ধ্রুপদি কিছু বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ একত্রিত করা হয়। সেসব প্রবন্ধ সিরিজ আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। মোবাইলফোন বলতে গেলে সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি এখন নতুন প্রজন্মের কাছে শিশুকাল থেকে সহজলভ্য। এর বাইরে আছে নানা ধরনের ভিডিও গেম।

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলার জন্য মৌলিক বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে সহজবোধ্য মৌলিক বিজ্ঞানের বইয়ের

অপ্রতুলতা রয়েছে। আবার যে বইগুলো সচরাচর পাওয়া যায় তার বর্ণনা ও উপস্থাপনা উপভোগ্য নয়। এ কারণে বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোররা সেসব বই পড়ায় আগ্রহী হয় না। কিন্তু শিশু-কিশোরদের মনের মাঝে প্রকৃতির নানা বিষয়ের প্রতি জানার সহজাত আগ্রহ রয়েছে। এ সহজাত আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে সহজেই বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন করা যায়।

প্রথম পর্বে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়টি নির্বাচন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী গাছপালা ঘাস লতাপাতা সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের কৌতূহলী করে তোলা। মূলত শিশু-কিশোরদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রবন্ধগুলো সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবন্ধের শিরোনামে সামান্য পরিমার্জন আনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুতে সাম্প্রতিক সময়ে যে পরিবর্তন এসেছে তা সংযুক্ত হয়েছে।

এ পর্বে প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে 'উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ'। পৃথিবীতে কীভাবে উদ্ভিদ সৃষ্টি হলো-এ প্রশ্ন আমাদের মনে ঘুরে ফিরে আসে। 'উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে অত্যন্ত সহজভাবে ভূতাত্ত্বিক সময়কাল অনুসারে পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদের আগমন এবং সরল উদ্ভিদ থেকে উন্নত শ্রেণির বিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরবর্তী প্রবন্ধগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে উদ্ভিদের ছড়িয়ে পড়ার কৌশল, উদ্ভিদের খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য উৎপাদন ও পরিপুষ্টি, অঙ্কুরোদ্গমের বৈচিত্র্য, বংশবিস্তার কৌশল ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের বিজ্ঞানভিত্তিক জবাব পাওয়া যাবে।

উদ্ভিদজগৎ বলতে যে শুধু গাছপালা ও ঘাস লতাপাতা নয়, নানা ধরনের অণুজীবও রয়েছে। সে সম্পর্কে ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে 'পরজীবী' ও 'উপকারী জীবাণুর কথা' প্রবন্ধ দুটি সংযোজন করা হয়েছে।

বইয়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে উদ্ভিদ জাদুকর বিজ্ঞানী লুথার বার্বাঙ্কের জীবনী দেয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এটি শিশু-কিশোদের জন্য অণুপ্রেরণার রসদ হিসেবে কাজ করবে।

মূলত শিশু-কিশোরদের মৌলিক বিজ্ঞান ও প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সিরিজ বা প্রবন্ধমালা প্রকাশ। শিশু-কিশোররা এতে যদি সামান্য উপকৃত হয় তাতেই এ আয়োজন সার্থক হবে।

উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা আমাদের বর্তমান পৃথিবী শুরু থেকেই এরকম ছিল না। পৃথিবীর তাপ, মাটি ও পানি প্রভৃতির ধারাবাহিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতেরও একটা স্বাভাবিক ক্রমপরিবর্তন ঘটে। আজকের সবুজ পৃথিবী ও প্রাণ সৃষ্টির প্রথম অবস্থার পৃথিবীর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান কালের উদ্ভিদসমূহ প্রাচীন যুগের উদ্ভিদেরই বংশধর। বর্তমান সভ্যতা যেমন প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশের উন্নততম স্তর, তেমনি বর্তমান যুগের উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুও প্রাচীন যুগের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ অথবা জীবের উন্নততর ক্রমবিকাশমাত্র। তবে এই ক্রমবিকাশের ধারা গতিশীল। সাধারণভাবে এই ব্যাপারটি রহস্যজনক মনে হলেও বিজ্ঞানীদের চেষ্টার ফলে উদ্ভিদজগতের এই ক্রমবিকাশের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

উদ্ভিদজগতের ক্রমবিকাশের কথা জানতে হলে কীভাবে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল তা জানা দরকার। প্রাণের প্রথম বিকাশ সম্বন্ধে মানবসভ্যতার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও দার্শনিকেরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মতে, অজৈব পদার্থ থেকেই প্রথম প্রাণের বিকাশ ঘটে। রাশিয়ান রসায়নবিজ্ঞানী এ. আই. ওপেরিভের মতে, পৃথিবীর উত্তপ্ত অবস্থা থেকে শীতল হওয়ার সময় প্রথম কার্বাইড তৈরি হয়। এই কার্বাইড জলীয়বাষ্পের সঙ্গে মিশে হাইড্রোকার্বন তৈরি করে। হাইড্রোকার্বনের একাংশ অ্যামোনিয়ার সঙ্গে মিশে নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থের সৃষ্টি করে। এইসব নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ পানির সঙ্গে রাসায়নিকভাবে মিলনের ফলে প্রোটিনজাতীয় জটিল জৈব পদার্থের সৃষ্টি করে। ক্রমে তাতে দেখা দেয় প্রাণের স্পন্দন। হয়তো এভাবে রাসায়নিক সংযোগের ফলে প্রাণের ভূমিকা সৃষ্টি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে।

উদ্ভিদজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যে স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই ঘটেছে, সে সম্বন্ধে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই একমত। তাঁদের মতে, নিম্নস্তরের আণুবীক্ষণিক এককোষী জীব থেকেই বর্তমানের বিভিন্ন উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটেছে। এই এককোষী জীবের সৃষ্টি হয়েছে প্রোটিনজাতীয় জৈব পদার্থ থেকেই।

পৃথিবীর বয়স প্রায় পাঁচশ কোটি বছর। সৃষ্টির প্রথম যুগে এটা একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো ছিল। তারপর আসে গ্যাসীয় ও তরল অবস্থা। সেই সময়েও পৃথিবীর উত্তাপ ছিল প্রচণ্ড। সেই প্রচণ্ড উত্তাপে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। তাপ হারিয়ে পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল থেকে থাকে। ক্রমে ভূত্বক তৈরি হয় এবং প্রাণ ধারণের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয়।

জীববিজ্ঞানীদের মতে, জীবজগতের আদিরূপটির সন্ধান পেতে হলে, আজ থেকে অন্তত দেড়শ কোটি বছর আগের অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। সেই সমুদ্রের পানি অপেক্ষাকৃত গরম ছিল। তাতে লবণের ভাগ এরকম ছিল না। অক্সিজেন তখনও তৈরি হয়নি। এই সময়ে সমুদ্রের পানিতে সৃষ্টি হয় ছোট ছোট অসংখ্য জীবাণু। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে, ভূপৃষ্ঠের আদিম সমুদ্রে জেলির মতো আদিম জীবেরা কোটি কোটি বছর ধরে জীবনযাপন করেছে।

জেলির মতো থলথলে পদার্থটিকে প্রাণী অথবা উদ্ভিদ কোনো সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পূর্বপুরুষ এরাই। তখনকার অন্ধকারময় পরিবেশে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সামুদ্রিক জৈব ও অজৈব পদার্থই ছিল এদের পুষ্টির উৎস।

পৃথিবীর ইতিহাসের শেষের ৫০ কোটি বছরের দিকে লক্ষ করলে উদ্ভিদজগতের বিবর্তনের বিশেষ ধারাটি দেখতে পাওয়া যায়। এক এক ধরনের উদ্ভিদ এক এক যুগে আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফসিল থেকে আমরা বিভিন্ন যুগের উদ্ভিদের পরিচয় পেতে পারি। পৃথিবীর ইতিহাসের শেষের ৫০ কোটি বছরকে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি ভাগের নাম পুরাজীবীয় (Paleozoic), মধ্যজীবীয় (Mesozoic), নব্যজীবীয় (Caenozoic)। এইসব নাম থেকেই কোন যুগে কোন উদ্ভিদের প্রাচুর্য ছিল তা জানতে পারা যায়। এক একটি যুগ শেষ থেকে কোটি কোটি বছর সময় লেগেছে। আজকের দিনের ভূপৃষ্ঠের যে বৈচিত্র্য তা এইসব যুগেরই সৃষ্টি।

প্রত্যেক যুগকে আবার ভূতাত্ত্বিকগণ ছোট ছোট ভাগে ভাগ করেছেন। পুরাজীবীয় যুগটি ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা—১. ক্যাম্ব্রিয়ান, ২. অর্ডোভিসিয়ান, ৩. সিলুরিয়ান, ৪. ডেভোনিয়ান, ৫. কার্বনিফেরাস ও ৬. পার্মিয়ান।

মধ্যজীবীয় যুগটি তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—১. ট্রিয়াসিক, ২. জুরাসিক, ৩. ক্রেটাশিয়াস এবং

নব্যজীবীয় যুগটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত; যথা—১. ইয়োসিন, ২. অলিগোসিন, ৩. মাইওসিন, ৪. প্লিওসিন, ৫. প্লিস্টোসিন। এই যুগগুলোর আগের যুগগুলোকে প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ বলে উল্লেখ করা হয়।

পুরাজীবীয় যুগেই জেলির মতো থলথলে (জীবাণুবিজ্ঞানীরা একে জীবনের প্রথম চিহ্ন মনে করেন) জীবজগতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। ততদিনে অন্ধকার অবস্থা কেটে যেতে শুরু করে এবং সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু রাজ্যে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। জীবাণুরা সমুদ্রের পানি ছাড়াও সূর্যের আলোর সাহায্য নিয়ে নিজেদের পুষ্টিসাধনের উপায় খুঁজে বের করতে থাকে। সূর্যের আলোর প্রভাবে একদল জীবাণুর দেহে ক্লোরোফিল তৈরি হয়। ফলে তারা বাতাস থেকে নিজেদের পুষ্টিসাধনের উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বাতাসে তখন অনেক কার্বন ডাই-অক্সাইড। সূর্যের আলোও অফুরন্ত। ফলে, এদের শরীর দিন দিন হুহু করে বাড়তে থাকে। এরূপ বেহিসাবি বাড়াবার ফলেই আদিম জীবাণুর দেহের নানা প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদের জন্ম হয়। অপর একটি গ্রুপ ক্লোরোফিলবিহীন হয়ে পরভোজী হয়ে উঠল। এভাবেই ক্রমে জীবজগতের সৃষ্টি হলো।

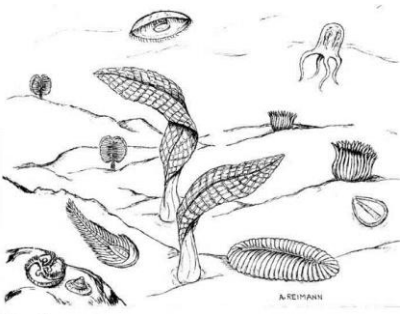

ছবি : ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের জীব

আদিতে উদ্ভিদের মধ্যে কোনো লিঙ্গভেদ ছিল না। বংশবৃদ্ধির সহজ, সরল ও প্রাচীনতম প্রক্রিয়া—কোষ-বিভাজনই আদিম উদ্ভিদজগতের একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কোষগুলোর দৈহিক পার্থক্য মোটেই ছিল না। কোষ-বিভাজন দ্বারা উৎপন্ন জীবগুলো পৃথক পৃথকভাবে অথবা দলবদ্ধ অবস্থায় থাকত। দলবদ্ধ অবস্থায় এরা বিভিন্ন কলোনি, রেখা ইত্যাদি অবস্থায় দেখা দেয়। বিভিন্ন ধরনের দলবদ্ধ অবস্থা আজও বিভিন্ন শ্রেণির শৈবালে দেখতে পাওয়া যায়। আদিম উদ্ভিদের বিভিন্ন দলবদ্ধ অবস্থা থেকেই শৈবালের জন্ম হয়। শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ থেকেই বর্তমান কালের উচ্চশ্রেণির গাছপালার সৃষ্টি হয়েছে।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর পানি, মাটি এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। সাগরের আয়তন কমে ক্রমে স্থলভাগের আয়তন বাড়তে থাকে। সাগরের পানি কমতে থাকায় কিছু উদ্ভিদ সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে স্থলভাগে এসে সেখানকার মাটিতে আটকে যায়। সাগরের জলরাশির দ্বারা তারা মাঝে মাঝে প্লাবিত হতো, আবার জল নেমে গেলে শুকনো ডাঙায় পড়ে থাকত। এভাবে তাদের উভচর স্বভাব গড়ে ওঠে। মসজাতীয় উদ্ভিদ এই উভচর উদ্ভিদের নিদর্শন।

স্থলভাগে আসার ফলে সূর্যের তাপের প্রভাবে উদ্ভিদদেহের ক্লোরোফিলের পরিমাণ বেড়ে ওঠে। এই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে যায়। ক্রমে অন্যান্য পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজকে খাপ খাওয়াবার জন্যে শরীরের চারদিকে শক্ত ত্বকের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের ঢেউ যাতে উভচর উদ্ভিদকে স্থানচ্যুত করতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে শরীরকে মাটিতে শক্তভাবে আটকে রাখার জন্যে শিকড়ের সৃষ্টি হয়। উভচর উদ্ভিদ থেকেই স্থলজ উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ঘটে।

জলজ উদ্ভিদ থেকে স্থলজ উদ্ভিদের সৃষ্টি পর্যন্ত ক্রমউন্নতির ধারায় উদ্ভিদের শরীরের অঙ্গ সংস্থান ও বংশবিস্তার প্রভৃতি বিভিন্নভাবে চলতে দেখা যায়। উভচর উদ্ভিদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বংশবিস্তার প্রক্রিয়ারও অনেক পরিবর্তন হয়। যৌনপ্রক্রিয়া অযৌন বংশবৃদ্ধির স্থান দখল করে। আবার যৌনপ্রক্রিয়ার প্রথম দিকে কিন্তু যৌনাঙ্গের কোনো বালাই ছিল না। সাধারণ অঙ্গজ কোষেই জননকোষ তৈরি হতো। জননকোষসমূহের আকৃতি ও প্রকৃতি একই রকম ছিল। স্পাইরোগাইরা প্রভৃতিতে দেখা যায়, দুটি সুতার মতো কাছাকাছি